মওলানা আবদুল আউয়াল

জামাতের আসল চেহারা

বর্ধিত সংস্করণ

স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা

সত্তরের নির্বাচনে জামাতে ইসলামী পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অংশ নেয়। সারা পাকিস্তানে দলটির মনোনীত ২শ' প্রার্থীর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র চারজন জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়। পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ আসনে তাদের জামানত বাজেয়াফত হয়। প্রাদেশিক আমীর গোলাম আযম আওয়ামী লীগের জহিরুদ্দিনের ১ লাখ ১৬ হাজার ২০৪ ভোটের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫ হাজার ৫২৭টি ভোট লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর তৈরি জটিলতার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার পর স্বাধীনতার দাবিতে পূর্ব বাংলায় দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় অন্তর্ঘাতমূলক কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসে জামাতে ইসলামী। পূর্ব বাংলার সপক্ষে জামাতে ইসলামী যে কোনো ভূমিকাই নেয়নি, তার বড় প্রমাণ মওদুদীর একটি বিবৃতি। এতে তিনি আওয়ামী লীগের নিন্দা করে বলেন, "কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাচ্ছেন তাদের একথা জানা দরকার, তেমন কোনো শাসনতন্ত্র সফল হবে না এবং সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই দায়ী থাকতে হবে।"[১]

পাক দখলদার বাহিনী নিধন অভিযান শুরু করলে জামাতে ইসলামীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। নূরুল আমীনের নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল প্রথম সুযোগেই খুনী জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোলাম আযম 'অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস' দিয়েছিলেন। দু'দিন পর ৬ এপ্রিল গোলাম আযম পৃথকভাবে টিক্কা খানের সঙ্গে আবার দেখা করেন। এই বৈঠকে অন্য দালালদের মতো গোলাম আযম স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, "ভারতের এই অভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্য প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে।"[২]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অংকুরেই ধ্বংস করার পাশবিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল গঠিত 'শান্তি কমিটি'তে জামাতে ইসলামী প্রধান ভূমিকা রাখে। এরপর ১৫ এপ্রিল গঠিত প্রাদেশিক শান্তি কমিটির তিন নম্বর সদস্য মনোনীত হন গোলাম আযম। আহ্বায়ক ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরুদ্দিন।[৩]

শান্তি কমিটির প্রথম বৈঠকে 'ভারতীয় ও অন্যান্য ইসলামবিরোধীদের' বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিলো। বৈঠকের এক প্রস্তাবে "দেশপ্রেমিক নাগরিক, আইনজীবী, মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মোদাররেসদের প্রতি জনসাধারণকে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার আহ্বান জানানো হয়, যাতে জনসাধারণ ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবেলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। গোলাম আযমদের এই শান্তি কমিটি ২২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীর প্রতি রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে সবরকমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছিলো।"[৪]

এপ্রিলেই যুদ্ধরত বাংলাদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি তার স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা শুরু করে। প্রতিটি জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে জামাতে ইসলামী এর নেতৃত্ব দখল করে। পিডিপি ও মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে জামাতের দালালরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে গ্রামে গ্রামে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। মানুষের গরু-খাসিসহ অর্থ-সম্পদ লুট করতো, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতো, নারী নির্যাতনেও সহায়তা করতো। পাকিস্তান রক্ষায় তাদের এই ভূমিকা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট করে। জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য জেনারেল টিক্কা খানের মতো খুনীও তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়ক হবে। রাজশাহীতে গবর্নর হিসেবে টিক্কা খান সফরে গেলে শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়, 'সারা রাজশাহী বিভাগে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হয়েছে।' জবাবে টিক্কা খানও জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের উত্তম কাজের প্রশংসা করেন। টিক্কা খান 'গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানাবার জন্য তাদের আহ্বান জানান, যাতে করে আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীগুলো তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।'[৫]

অন্য এক উপলক্ষে রংপুরে 'গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের' নির্মূল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজে সহায়তা করার জন্য শান্তি কমিটি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন টিক্কা খান তার 'প্রশংসা' করেন। শান্তি কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে টিক্কা খান বলেন, "তারা প্রদেশে সর্বত্র শান্তি বজায় রাখা এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।" পত্রিকার একই প্রতিবেদনে রয়েছে, "দিনাজপুরে শান্তি কমিটির সভাপতি গভর্নরকে জানান, সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া গেছে।"[৬]

স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে খুনী জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো জামাতে ইসলামী। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে গোলাম আযম বলেন, "কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে

হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ বাইরের দুশমনের চেয়ে ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে তারা অনেক বেশি বিপজ্জনক।"

১৬ আগস্টের দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়েছে, "সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামাত নেতা (গোলাম আযম) বলেন, "বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিত যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায়, তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্যদিকে মোড় নিত।" তিনি বলেন, "দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। তাই দেশের মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে।" এছাড়া ঘরে ঘরে যেসব 'দুশমন' রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, "দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ করে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, 'পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক কাল হোক বাঙ্গালী মুসলমানদের হক আদায় হবে। কিন্তু আজাদী ধ্বংস হলে মুসলমানদেরকে শৃগাল-কুকুরের মত মরতে হবে।"

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতিরোধ যত তীব্র হতে থাকে জামাতিরা মিথ্যের আশ্রয় তত বেশি নিতে থাকে। ১৯ মে পূর্ব পাকিস্তান জামাতের সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালেক ও শ্রম সম্পাদক মোহাম্মদ শফিউল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বদেশের পবিত্র মাটি থেকে পাকিস্তানবিরোধীদের উৎখাত করার আহবান জানান। তারা বলেন, "আল্লাহর মেহেরবানীতে পাকিস্তান বিরোধী দুষ্কৃতকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ত্রাসের রাজত্ব খতম হয়েছে এবং পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।"

গণহত্যার রক্তস্রোতে যখন নদীমাতৃক বাংলা রঞ্জিত, নির্যাতিত-লাঞ্ছিত এদেশের অনেক পবিত্র মা-বোনেরা, তখন ৮ জুলাই জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী আবদুল খালেক এক বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার ভারতীয় চক্রান্ত জনগণ পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে।"

মুক্তিযোদ্ধাদের 'পাকিস্তানের শত্রু ও দুষ্কৃতকারী' বলে আখ্যায়িত করেন জামাত প্রধান মওলানা আবুল আলা মওদুদী। ১০ জুলাই '৭১ লাহোরে পাকিস্তানের এই সংকটকালে জনসাধারণকে আল্লাহ ও রাসুলে করীমের পথে অবিচল থাকার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, "অন্যথায় শত্রু ও দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্ত নির্মূল করা সম্ভব নাও হতে পারে।" ১৩ জুলাই রংপুরে জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী ও পাকিস্তানের শত্রু বলে নিন্দা করেন এবং তাদেরকে খতম করার আহবান জানান। ১৫ জুলাই মিয়া তোফায়েল পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর এবং 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে কুখ্যাত লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গবর্নর হাউসে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোলাম আযম। এরপর ১৭ জুলাই কুষ্টিয়ায় মিয়া তোফায়েল সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের (মুক্তিকামী জনগণকে) দমন করে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৯ জুলাই করাচী ফিরে গিয়ে মিয়া তোফায়েল

বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়েছে।" কিন্তু 'বিদ্রোহ' নির্মূল হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের হানা তীব্রতর হচ্ছিলো। ২৫ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী এবং কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক সদস্য আবদুল খালেক এক বিবৃতিতে তা স্বীকার করেন। তিনি সীমান্ত এলাকা বরাবর ভারতের বিরামহীন উস্কানিমূলক তৎপরতার তীব্র নিন্দা করেন। এর চারদিন পরের বিবৃতিতে বোঝা যায় গোলাম আযম মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর কি পরিমাণ রুষ্ট ছিলেন। ১৮ আগস্ট লাহোরে তিনি বলেন, "ভারত দুষ্কৃতকারীদের ('৭১ সালে পাকিস্তানীদের ভাষায় মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন দুষ্কৃতকারী) সাহায্য করছে। তাই পাকিস্তানের উচিত কালবিলম্ব না করে ভারত আক্রমণ করা এবং আসাম দখল করা।" লাহোরে গোলাম আযম গিয়েছিলেন জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে আহূত বৈঠকে যোগ দিতে। ১৯ আগস্ট দলের সদর দফতরে আয়োজিত এই বৈঠকে নায়েবে আমীর মওলানা আবদুর রহিম সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, '৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত উপনির্বাচন, পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্র, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কতিপয় বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ, পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারা (ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী) লোকদের পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। ২০ আগস্টের অধিবেশনে জামাত ভারতের অব্যাহত উস্কানি ও শত্রুতামূলক আচরণের প্রেক্ষিতে জেহাদের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহবান জানায়। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের আমীর গোলাম আযম ও সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল খালেক বক্তৃতা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ২৩ আগস্ট গোলাম আযম লাহোরে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা ভারত ও তার চরদের ষড়যন্ত্রেরই ফল। একমাত্র ইসলামের শক্তিই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারে।" তিনি বলেন, "যারা জামাতে ইসলামীকে দেশপ্রেমিক সংস্থা নয় বলে আখ্যায়িত করছে তারা হয় জানে না বা স্বীকার করার সাহস পায় না যে, ইসলামের আদর্শ তুলে ধরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরোধিতা করার জন্যই কেবল পূর্ব পাকিস্তানে জামাতের বিপুল সংখ্যক কর্মী দুষ্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।" জামাতের এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবনধারা পুনরুদ্ধার, মিলিতভাবে 'দুষ্কৃতকারীদের' নির্মূল করার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আবেদন জানান হয়।

৩১ আগস্ট গোলাম আযম হায়দরাবাদের এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। এ প্রসঙ্গে গোলাম আযম বলেন, 'বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত ও সরকার কর্তৃক বহাল ঘোষিত ৮৮জন সদস্যের অধিকাংশই পাকিস্তানে নেই।' তিনি বলেন, 'বর্তমান মুহূর্তের আশু প্রয়োজন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রিয় লোকজনের হাত শক্তিশালী করা। এসব লোক পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে এবং 'দুষ্কৃতকারীদের' রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ও 'বিদ্রোহীদের'

দমনে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করছে। অধ্যাপক গোলাম আযম দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।' পরদিন গোলাম আযম পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে শাস্তি দেয়ার দাবি জানান। তিনি এ প্রসঙ্গে ভাসানী ন্যাপ, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ, ওয়ালী খান ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার নাম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে 'এসব দলের সদস্যরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে গোপন তৎপরতা চালাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে হতাশার ভাব সৃষ্টি করছে।' অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "কোন ভালো মুসলমানই তথাকথিত 'বাংলাদেশ আন্দোলনের' সমর্থক হতে পারে না।" তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্যে একমনা ও দেশপ্রেমিক লোকরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন।' রাজাকাররা খুবই ভালো কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান জামাতের ডেপুটি আমীর মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম, পূর্ব পাক জামাতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর পদে ডাঃ এ এম মালিকের নিয়োগকে অভিনন্দিত করেন এবং সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা শাখা জামাতের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ৬ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবস' পালনের জন্য শাখাগুলোকে নির্দেশ দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এদিন আমাদের পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার জন্য শপথ নিতে হবে।' ১০ সেপ্টেম্বর গোলাম আযম এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার জন্যে গঠিত পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলটি গঠনের সমালোচনা করে বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্বের প্রেক্ষিতে প্রতিনিধিদলটি যথাযোগ্যভাবে গঠিত হয়নি। তিনি বলেন, 'প্রতিনিধিদলের তালিকায় হামিদুল হক চৌধুরী, বিচারপতি (অবঃ) এ কে এম বাকের, মৌলবী ফরিদ আহমদ, বিচারপতি হামুদুর রহমান, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, খান এ সবুর, ফজলুল কাদের চৌধুরীর মত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিলো।'

১৭ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর ডাঃ মালেক ১০ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদের ৯ জনের শপথ গ্রহণ করান। এরা এর আগে কখনো মন্ত্রিত্ব করেননি। মন্ত্রীদের মধ্যে ২ জন ছিলেন জামাতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান (বর্তমানে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর) এবং জামাত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ। ২০ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে গবর্নরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের এক আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ২৪ সেপ্টেম্বর জামাত মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের এক সংবর্ধনা দেয়। এখানে গোলাম আযম বলেন, 'জামাতের কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়।' ২১ সেপ্টেম্বর গোলাম আযম এক বিবৃতিতে উদ্বাস্তুদের (ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তানী) জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে এবং তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দানে ভারতকে বাধ্য করার

জন্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রতি আকুল আবেদন জনান।

জাতীয় পরিষদের তথাকথিত উপনির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে বহু চিঠি ও তারবার্তা পাওয়ার তথ্য জানিয়ে ১৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "খাঁটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পরিবেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা আমার দেশ শাসিত হোক তা দেখার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।"

২২ নভেম্বর গোলাম আযম পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৩ নভেম্বর লাহোরে তিনি রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে গিয়ে কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানান। লাহোরে তাঁকে দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে যান। পূর্ব পাকিস্তান থেকে গোলাম আযমের এটা ছিলো শেষ যাওয়া—হয়তো কর্মীদের পরিত্যাগ করে পলায়ন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মওলানা আবদুর রহীম ও মওলানা এ কে এম ইউসুফ। গোলাম আযম এর দীর্ঘ সাত বছর পর বাংলাদেশে প্রবেশ করতে সক্ষম হন '৭৮ সালের ১১ জুলাই।

২৭ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে গোলাম আযম বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ভারতের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে এবং তাদের পবিত্র মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমিও ভারতকে দখল করে নিতে দেবে না।' ২ ও ৩ ডিসেম্বর গোলাম আযম সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এপিপির খবরে লাহোর থেকে বলা হয়, ১ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লাহোরে ফিরে এসে গোলাম আযম বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনো তাদের দাবির প্রতি মিসেস গান্ধীর সমর্থন চায়নি।' এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক আযম বলেন, 'পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্যে অবিলম্বে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা উচিত।'

এ পর্যন্ত উপস্থাপিত তথ্য ও ঘটনাবলীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে জামাতে ইসলামী কেবল বিরোধী অবস্থানই নেয়নি, একে সমূলে নস্যাতের জন্যও দলটির প্রচেষ্টা ছিলো সর্বাত্মক। জামাতের জন্মকালে জনগণের বিরুদ্ধে শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার যে ন্যক্কারজনক নীতি মওদুদী অবলম্বন করেছিলেন তা-ই পরবর্তীকালে জামাতে ইসলামীকে প্রভাবিত রেখেছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যেও তারা একই কারণে পেয়েছিলো ভারতীয় আধিপত্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আতঙ্ক। একাত্তরে দলীয় ভূমিকার কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯৭৮ সনের মে মাসে প্রকাশিত 'জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকায় জামাতে ইসলামী বলেছে, "পাকিস্তান ভেঙে যাক এটা অবশ্যই জামাত চায়নি। কেননা সে সময় জয় বাংলা ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানই প্রধান ছিল। 'নারায়ে তকবীর—আল্লাহু আকবর' তখন শোনা যায়নি। আর এজেন্যই তখন ভারতের আধিপত্যের ভয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আতঙ্কে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে (জামাত) বিশ্বাস করতে পারেনি।"[৭]

লক্ষণীয় যে, জামাতে ইসলামী গাঁয়ে না-মানা মোড়লের মতো ইসলাম ও

মুসলমানদের কল্যাণের ধুয়া তুলে স্বদেশের নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের স্বার্থের প্রশ্নটিকেই এড়িয়ে গেছে। যুক্তি হিসেবে প্রাধান্যে আনতে চেয়েছে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বিষয়টি। আসলে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর প্রতি জামাতের আদৌ মমত্ব ছিলো না। তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক বিজাতীয় শাসক–শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করার মধ্য দিয়ে তল্পীবহনের মওদুদীয় নীতিকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলো।

স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন না করাটা অন্যায় হলেও মারাত্মক 'অপরাধ' নয় সত্য, কিন্তু একাত্তরে জামাতে ইসলামী তার ভূমিকাকে এমনিতর নীতিগত প্রশ্নেই শুধু সীমাবদ্ধ রাখেনি। ইতিহাসের পর্যালোচনা বরং এই সত্যই তুলে ধরে যে, বিরোধিতার নামে স্বাধীনতা সংগ্রামকে নির্মূল করার চেষ্টার পাশাপাশি নৃশংসতার সাথে জাতি হিসেবে বাঙ্গালীদের উৎখাতেরও ভয়ংকর কর্মসূচী নিয়ে জামাতিরা এগোতে শুরু করেছিলো। এজন্যই তারা রাজাকার ও বদর বাহিনী তৈরি করেছে, শান্তি কমিটিতে যোগদান সহ সর্বতোভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে পাকিস্তানের খুনী সেনাবাহিনীকে। বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রকেই হত্যা করার সুপরিকল্পিত কার্যক্রম এবং মন্ত্রিত্বের সুযোগ নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগও ছিলো এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উদ্ভাবিত। শোষণ ও শাসনের স্থায়ী পদানত অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশকে রূপান্তরিত করার যে প্রক্রিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলে আসছিলো, ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তার নামে জামাতে ইসলামী স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার উদ্ধত পদক্ষেপ নিয়েছিলো। বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিনাশ ছিলো জামাতের সকল আয়োজনের উদ্দেশ্য।

শঠতা, সুবিধাবাদ, স্ববিরোধিতা এবং নাশকতার প্রবণতা সব সময় জামাতের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা সম্পর্কে জামাতিরা একদিকে বলছে, "একাত্তর সালে আমরা যা করেছি, ঠিকই করেছি।" অপরদিকে বলছে, "তাই বলে টিক্কা খানের সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করার নামে যতো অমানবিক কাজ করেছে, তা কখনই জামাত সমর্থন করেনি।"[৮]

সত্যি, জামাতিদের মুখে এসব কথা শুনলে হাসি পায়। মূলত বাঙ্গালী জাতিসত্তাকে জামাত কোনদিনই মেনে নিতে পারেনি। একাত্তরে তাই প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থান নেয়ার সাথে সাথে জাতি হিসেবে বাঙ্গালীদের সমূলে উৎখাতেরও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় জামাত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলো। ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দলটি জনগণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে অবস্থান গ্রহণের ধ্বংসাত্মক নীতিকে অব্যাহত রেখেছে। ইংরেজ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তানী ক্ষমতাসীনদের পদলেহন ছিলো রাজনীতির নামে এর কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ করে, বাঙ্গালীর জাতিগত ঠিকানা এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়েই জামাতিরা অত্যন্ত ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছে। তাদের নৃশংসতা এমনকি পাক হানাদার বাহিনীকেও অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে।

পাদটীকা :

১. পাকিস্তান অবজারভার, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
২. দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
৩. দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।
৪. দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১।
৫. দৈনিক পাকিস্তান, ৬ জুলাই, ১৯৭১।
৬. দৈনিক পাকিস্তান, ১২ আগস্ট, ১৯৭১।
৭. জামায়াতের আবেদন, ১১ পৃষ্ঠা।
৮. জামায়াতের আবেদন, ১১ পৃষ্ঠা।

রাজাকার আলবদর বাহিনী

শান্তি কমিটির মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধী তৎপরতাকে সর্বাত্মক করার জন্য একই সঙ্গে জামাতে ইসলামী সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীও গড়ে তোলে। ৯৬ জন জামাত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনার খান জাহান আলী রোডের আনসার ক্যাম্পে মে মাসে রাজাকার বাহিনীর প্রথম দলটি গঠন করেন জামাত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে জামাতে ইসলামীর এই সশস্ত্র বাহিনী হত্যা, নির্যাতন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিতে পাক হানাদার বাহিনীর কেবল তল্পীবাহক হিসেবেই কাজ করেনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অত্যাচার হানাদার বাহিনীর চাইতেও অনেক বেশি ক্ষতি ও সর্বনাশের কারণ ঘটিয়েছিলো। শত্রু কবলিত বাংলাদেশের একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা এই রাজাকারদের হত্যা, লুণ্ঠন এবং নির্যাতনের শিকার হননি।

জামাতে ইসলামীর নিজস্ব উদ্যোগে গঠিত রাজাকার বাহিনীকে পাকিস্তানের সামরিক সরকার অল্পদিনের মধ্যেই আধা-সামরিক বাহিনীতে পরিণত করে। পাক সেনাবাহিনীকে স্বাধীনতা যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কার্যকর সহযোগিতা প্রদানে উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এদের এক থেকে তিন-চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণের সরকারী ব্যবস্থা করা হতো। সাধারণত ৩০৩ রাইফেল দিয়ে তাদের সশস্ত্র করা হতো। রাজাকাররাও তাদের 'দেশপ্রেমের' সরকারী স্বীকৃতি পেতে থাকে। সিলেট সফরকালে ৮ জুলাই জেনারেল নিয়াজী 'দুষ্কৃতকারীদের নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করার জন্য' রাজাকারদের প্রশংসা করেন। ১১ আগস্ট রংপুরে গবর্নর টিক্কা খান একই সুরে বলেন, 'রাজাকাররাও দুষ্কৃতকারীদের হামলার মুখে নিজ নিজ এলাকা রক্ষা এবং সেতু ও কালভার্ট পাহারা দিয়ে বিশেষ দরকারী ভূমিকা পালন করছে।' ১৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকারদের পরিদর্শনকালে জেনারেল নিয়াজী তাদের 'মনোবল ও উৎসাহের' প্রশংসা করেন।

জামাতে ইসলামী রাজাকার বাহিনীর প্রশ্নেও পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো। ১ সেপ্টেম্বর করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম 'পাকিস্তান রক্ষা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য পাক সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।' গোলাম আযম বলেন, 'কোন ভাল মুসলমানই তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।'

তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য একমনা ও দেশপ্রেমিক লোকেরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন।' রাজাকাররা 'খুবই ভালো কাজ করছেন' বলে তিনি উল্লেখ করেন। নিহত রাজাকার রশীদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গোলাম আযম বলেন, 'এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে।'[১]

২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার হোটেল 'এম্পায়ার'-এ এক জামাতী সমাবেশে গোলাম আযম শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীতে জামাতে ইসলামীর অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে 'পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার' কথা উল্লেখ করে বলেন, "জামাতে ইসলামীর কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়।" গোলাম আযম বলেন, 'জামাতের কর্মীরা শাহাদাত বরণ করে পাকিস্তানের দুশমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা মরতে রাজী তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়।' গোলাম আযম আরো বলেন, "সারা প্রদেশ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরও যে কয়েক হাজার লোক শহীদ হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই জামাতের কর্মী।"[২]

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা নেতা মওলানা ইউসুফ ১১ অক্টোবর খুলনার জেলা স্কুল মিলনায়তনে এক রাজাকার সমাবেশে 'দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য' রাজাকারদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'বিপুল করতালির মধ্যে' মওলানা ইউসুফ ঘোষণা করেন, "দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার যেকোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের সাহসী জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।"[৩]

পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজীও রাজাকারদের সম্পর্কে একই আশা ব্যক্ত করেছিলেন। সাভারে রাজাকার বাহিনীর কোম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের ট্রেনিংশেষে কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর এক ভাষণে ২৭ নভেম্বর নিয়াজী বলেন, 'একদিকে তাদের ভারতীয় চরদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে এবং অপরদিকে বিপথগামী যুবকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে।"[৪]

জামাতে ইসলামীর রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে পাকিস্তানপন্থী সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেয়েছিলো। পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ৬ নভেম্বর "পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ করেন। কারণ, 'সেখানে রাজাকাররা খুব ভালো কাজ করছে।"[৫]

স্বাধীনতা যুদ্ধকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জামাতে ইসলামীর উল্লেখযোগ্য অপর এক প্রচেষ্টা ছিলো আলবদর নামের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। বদর বাহিনী এপ্রিল মাসের শেষদিকে প্রথম গঠিত হয় জামালপুরে। শিক্ষিত জামাত ও ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত বদর বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধরত বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তানী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা। পাক দখলদার বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে বদর বাহিনী সার্বিকভাবে জামাতে ইসলামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। স্বাধীনতাকামীদের খুঁজে

বের করা, হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান বানানো, সেমিনার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে জামাতী চিন্তাধারার প্রচার এবং প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা করা ছিলো এদের তৎপরতার উল্লেখযোগ্য দিক। 'বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায়' বদর বাহিনীর নৃশংসতা যুদ্ধের শেষ পাঁচটি মাসে জনমনে ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলো। পাকিস্তান কবলিত প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরেই এদের নিজস্ব 'ক্যাম্প' থাকতো।

এসব ক্যাম্পে ধরে আনা স্বাধীনতাকামীদের ক্রমাগত নির্যাতনের মধ্য দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। স্বাধীনতাযুদ্ধ অপ্রতিরোধ্যভাবে বিজয়াভিমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের তৎপরতাও বাড়ছিলো ভয়ঙ্করভাবে। শেষ দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক এবং সরকারী কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নিম্নপর্যায়ের চাকরিজীবী পর্যন্ত সামান্য শিক্ষিত বাঙ্গালী বলতেই বদর বাহিনীর শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। অন্য কথায়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালীদের সমূলে বিনাশ করার 'বিজ্ঞানসম্মত' হত্যাকাণ্ড ছিলো বদর বাহিনীর কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। 'পূর্ব পাকিস্তানে'র বেসামরিক গভর্নরের উপদেষ্টা জেনারেল রাও ফরমান আলীর নীলনকশা অনুযায়ী বদর বাহিনী এই তৎপরতা চালিয়েছিলো। বিশেষ করে যুদ্ধশেষের আগের কয়েকটি দিনে ঢাকায় সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যার মর্মান্তিক ঘটনাগুলো এর প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

বদর বাহিনীর সার্বিকভাবে গোলাম আযমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এর প্রকাশ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বর্তমান জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান নিযামী (সারা পাকিস্তান প্রধান), ঢাকা মহানগরীর আমীর আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ (প্রাদেশিক প্রধান), ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমীর মীর কাশেম আলী (তৃতীয় নেতা) এবং কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (প্রধান সংগঠক)।

জামাতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'ও সে সময় বদর বাহিনীকে উত্তেজিত করা শুরু করেছিলো। ১৪ সেপ্টেম্বর 'আলবদর' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 'সংগ্রাম' লেখে, "আলবদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী, আলবদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী, আলবদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আলবদর সাক্ষাৎ আজরাইল।"

ওদিকে বদর বাহিনীর প্রকাশ্য নেতারাও একই যোগে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসাস্থ বদর বাহিনী ক্যাম্পের এক সমাবেশে বদর বাহিনী প্রধান মতিউর রহমান নিযামী ২৩ সেপ্টেম্বর বলেছিলেন, "যারা ইসলামকে ভালোবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালোবাসে। এবারের উদঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।"

জামাতে ইসলামীর আলবদর বাহিনীর উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সম্পর্কে পরিচিত করার জন্য দৈনিক পাকিস্তানের একটি প্রতিবেদন প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিক 'বদর দিবস' পালনোপলক্ষে ১৯৭১-এর ৭ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্রসংঘের এক গণজমায়েতে সংঘের 'পূর্ব পাকিস্তান

শাখার' সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ 'চার দফা ঘোষণা' প্রচার করেছিলেন। প্রথম ঘোষণায় বলা হয়, 'দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্তানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবো না।' দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচারিত হয় লাইব্রেরীগুলোর উদ্দেশ্যে, 'আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে (কেউ) স্থান দিতে পারবেন না, বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।' তৃতীয় দফায় বলা হয়, 'পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকুন।' চতুর্থ দফায় বলা হয়, 'বায়তুল মোকাদ্দাসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে।'

"চার দফা ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, 'এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্য শির উঁচু করে, বুকে কোরান নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়াদিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো।"

"জমায়েতে 'পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের' সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী 'বদর দিবসের শপথ' হিসেবে তিনটি কর্মসূচি তুলে ধরেন, 'ক. ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো, খ. দুষ্কৃতকারীদের খতম করবো, গ. ইসলামী সমাজ কায়েম করবো।"

"জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মুহাম্মদ শামসুল হক। তিনি 'বাতিল শক্তিকে নির্মূল করার' শপথ নিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেন। জমায়েত শেষে অনুষ্ঠিত মিছিলের উল্লেখযোগ্য শ্লোগানগুলোর মধ্যে ছিলো 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে', 'বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতকে খতম কর', 'মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর' এবং 'ভারতের চরদের খতম কর।"[৬]

৮ নভেম্বরের দৈনিক 'সংগ্রাম' লিখেছে, "মিছিলকারী জিন্দাদিল তরুণরা ভারতীয় দালালদের খতম কর', 'হাতে লও মেশিনগান দখল কর হিন্দুস্তান', 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে' প্রভৃতি শ্লোগানে রাজধানীর রাজপথ মুখরিত করে তোলে।"

বদর দিবসের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে বদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিযামী ১৪ নভেম্বর দৈনিক 'সংগ্রামে' লেখেন, "·····বদর যোদ্ধাদের যেসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আলবদরের তরুণ মর্দে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সেসব গুণাবলী আমরা দেখতে পাবো।·····সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।"

বদর বাহিনীর অপর দুই প্রধান নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং মীর কাশেম আলী তাঁদের ২৩ নভেম্বরের বিবৃতিতে 'সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য' সংগঠনের সদস্যদের প্রতি আহবান জানান। এই সময়কালে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে বলা

হয়েছিলো, 'শত্রু আশপাশেই রয়েছে। তাই সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালাতে হবে। মনে রাখবেন, আপনারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কেবল যুদ্ধ করছেন না— এ যুদ্ধ ইসলামের। নমরুদদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীর (গোলাম আযমের) নির্দেশ পালন করুন।"

স্বাধীনতার পর পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত শত শত প্রতিবেদনে বদর বাহিনীর নৃশংসতার এক ভয়াবহ চিত্র রয়েছে। এই চিত্র হিটলারের গেস্টাপো, ভিয়েতনামের মাইলাই কিংবা লেবাননে প্যালেস্টাইনীদের সাবরা শাতিলা শিবিরের হত্যাযজ্ঞের চেয়েও হাজার গুণ ভয়াবহ। বদর বাহিনীর হাতে শুধু ঢাকার শত শত বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও শিল্পীই প্রাণ হারাননি, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিশিষ্ট নাগরিকও রেহাই পাননি। শুধু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডাক্তার আবদুল আলিম কিংবা সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন, নিজামউদ্দীন আহমেদ ও শহিদুল্লাহ কায়সারই আলবদর নামধারী নরঘাতকদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হননি— ভিন্ন মতাবলম্বী অনেক আলেমও তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। আওয়ামী ওলামা পার্টির সভাপতি মওলানা ওয়ালিউর রহমানও বদর বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। এইসব মর্মন্তুদ ঘটনা লিখে শেষ করা যাবে না।

পাদটীকা :

১. দৈনিক পাকিস্তান, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
২. দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
৩. দৈনিক পাকিস্তান, ১২ অক্টোবর, ১৯৭১।
৪. দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ নভেম্বর, ১৯৭১।
৫. দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নভেম্বর, ১৯৭১।
৬. দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১।